গল্পপাঠ নির্বাচিত

ইনতিযার হোসেইনের গল্প সংকলন

ইনতিযার হোসেইনের
গল্প সংকলন

সম্পাদক

মাজহার জীবন
জাভেদ হুসেন

KOBI PROKASHANI

ইনতিযার হোসেইনের গল্প সংকলন
সম্পাদক : মাজহার জীবন
জাভেদ হুসেন

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
সম্পাদক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৩৫০ টাকা

Intizar Hussainer Golpa Sangkalan edited by Mazhar Ziban & Javed Hussen
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: May 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 350 Taka RS: 350 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98947-4-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

জিন্নাতুনেছা বেগম

"আমাদের মা ছিলো অশ্রুবিন্দু—দিনরাত টলমল করতো
আমাদের মা ছিলো বনফুলের পাপড়ি;—সারাদিন ঝ'রে ঝ'রে পড়তো
আমাদের মা ছিলো ধানখেত-সোনা হয়ে দিকে দিকে বিছিয়ে থাকতো
আমাদের মা ছিলো দুধভাত-তিন বেলা আমাদের পাতে ঘন হয়ে থাকতো
আমাদের মা ছিলো ছোট্ট পুকুর-আমরা তাতে দিনরাত সাঁতার কাটতাম।"

সূ চি প ত্র

ইনতিযার হোসেইন কী খুঁজেছেন? • জাভেদ হুসেন ৯

বিক্রম, বেতাল আর গল্প • অনুবাদ : জাভেদ হুসেন ২১

ঘুম • অনুবাদ : নাহার তৃণা ২৭
কোলাহল • অনুবাদ : হাইকেল হাশমী ৩৩
হারিয়ে গেছে যারা • অনুবাদ : রঞ্জনা ব্যানার্জী ৩৯
শেহেরজাদের মৃত্যু • অনুবাদ : কুলদা রায় ৫৩
হাড়ের অবয়ব • অনুবাদ : সাবেরা তাবাসসুম ৫৯
সহযাত্রী • অনুবাদ : সালেহ ফুয়াদ ৬৯
ছায়া • অনুবাদ : প্রতিভা সরকার ৮০
স্বপ্ন ও ভাগ্য • অনুবাদ : বিপ্লব বিশ্বাস ৯১
দেয়াল • অনুবাদ : সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত ৯৭
অকারণ • অনুবাদ : উৎপল দাশগুপ্ত ১০৪
বন্দি • অনুবাদ : অমিতাভ চক্রবর্ত্তী ১০৭
সর্বশেষ মানুষ • অনুবাদ : মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ ১১৪
ঋষি ও কসাই • অনুবাদ : এলহাম হোসেন ১২২
মেঘ • অনুবাদ : মাজহার জীবন ১২৭

অনুবাদক পরিচিতি ১৩১

ইনতিযার হোসেইন কী খুঁজেছেন?

জাভেদ হুসেন

১.

ইনতিযার হোসেইন গল্প লিখেছেন। লিখেছেন উপন্যাস। বছরের পর বছর পত্রিকায় লিখেছেন। সেগুলোকে ঠিক গৎবাঁধা কলাম বলা যায় না। লিখেছেন স্মৃতিকথা। এইসব কিছুর মধ্যে ছিল দেশভাগের আগের তাঁর গ্রামের গল্প, সেই গ্রামের গাছে মানুষের পাশাপাশি থাকে পরী, বসতির এক প্রান্তে কোনো অজানা সাধুপুরুষের মাজারের সেবক জ্বিন। তাঁর গল্পে লাহোরে দাতা গঞ্জবখশের রওজার সামনে পথের ধারে ছাগুলে পা না-মানুষ যাত্রী ফাঁকি দিয়ে টাঙায় বসে পড়ে মানুষের পাশে। নন-ফিকশন গদ্যে বাগদাদের বাইরে মরুভূমিতে ক্যারাভানের যাত্রীদের গল্প শোনায় দাস্তানগো। ঝকঝকে আকাশের শামিয়ানায় গোল পূর্ণিমার চাঁদের নিচে গল্পের আসর। সে আসরে জন্ম নেয় আলিফ লায়লার হাজার কাহিনি। তাঁর নিয়মিত পত্রিকার লেখায় টিপু সুলতানের ভেঙে পড়া কেল্লার ছাদে মহিশুরের যুদ্ধে ইংরেজদের কামানের গোলায় নিহত ভারতীয় সৈনিকেরা পায়রা হয়ে অপেক্ষা করে। কীসের অপেক্ষা? সে কথা তিনি বলেন না স্পষ্ট করে। তবে পাঠকের তা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

তিনি বাস করেন একাধারে অতীতে আর বর্তমানে। যে যুগ এখনও আসেনি তার কথা লিখেছেন তিনি কদাচিৎ। অথবা তাঁর জগতে অতীত আর বর্তমান বলে আলাদা করে কিছু নেই। ব্যাপারটা ভাববার মতো বটে। মানুষ তো ইতিহাসচর্চার আড়ালে নিজেরই অতীতকে খুঁজে বেড়ায়। নিজেরই সৃষ্টি যা আজ তার কাছে অজানা, তার সামনে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে। নিজের অতীত যার কাছে অজানা তার কোনো বর্তমান কি করে থাকতে পারে? তাই ইনতিযারের ভারতবর্ষের মানুষের কোনো বর্তমান নেই। তাদের কোনো অতীতও নেই। যে অতীত থাকার কথা তা সে টুকরো করে কিছু অংশ সাজিয়ে রেখেছে জাতিরাষ্ট্র নামের জাদুঘরে। বাকিটা যেহেতু অন্যের, তাই আর তার নয়।

১৯৪৭ সালে সদ্য যুবক হয়ে ওঠা মানুষ ইনতিযার হোসেইন। তাঁর চারপাশের জগৎটিতে তিনি আগুনে জ্বলতে দেখেছেন। বহমান সময়ের স্রোতে তাঁর গ্রামের মানুষেরা নোঙর ফেলে বসে থেকেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। সেই জীবনে আগুন জ্বলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপকে ধাক্কা দিয়েছিল। ভারতবর্ষ পেয়েছিল এর চেয়ে

বড় আঘাত। রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে থাকা নিস্তরঙ্গ জীবনে হাজার বছর ধরে অভ্যস্ত মানুষগুলোও রক্তপিপাসায় মেতে উঠেছিল। পুড়ে যাওয়া সে জীবনে ইনতিযার ছাই ঘাটতে বসেছিলেন। যেমন গালিব এক শেরে বলেছেন :

জ্বালা হ্যায় জিসম জাহান দিল ভি জ্বল গয়া হোগা
কুরেদতে হো জো আব রাখ জুস্তজু কেয়া হ্যায়

যখন আমার শরীর পুড়েছে, হৃদয়ও পুড়েছে নিশ্চয়ই
এই যে ছাই ঘাটছ এখন, খুঁজছটা কী?

হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন। ইনতিযার খুঁজেছেন কী?

২.

১৯৬৩ সালে 'হামারে এহদ কা আদব' (আমাদের সময়ের সাহিত্য) নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ইনতিযার। উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের জন্মের পরের দশকে তাঁর চিন্তাধারার পাশাপাশি আরও কয়েকজন লেখকের আশাবাদ তুলে ধরা। লেখায় তিনি মোটাদাগে কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা বলেন। সেই সময় প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন নিয়ে মনে করতেন যে, তারা বাস্তবতাকে আগে থেকে ঠিক করে রাখা মতাদর্শ দিয়ে আটক করে ফেলতে চায়। এমনকি সাদাত হাসান মান্টোকে তাঁর মনে হয়েছিল যে, তিনি দেশভাগের সময়ে, এর আগে পরে ধর্ম নিয়ে দাঙ্গার মাঝে মানুষের সম্ভাবনার অন্বেষণ করেছিলেন। ইনতিযার মনে করতেন যে, এমন সম্ভাবনা থাকতেই হবে—সে নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে কীভাবে? আবার মুখতার সিদ্দিকী, কাইয়ুম নযর এবং ইউসুফ জাফরের মতো কবিও আছেন। মানুষের ওপর তাদের এমনই বিশ্বাস যে তাঁরা এই ঘটনার কোনো উল্লেখ করাই এড়িয়ে গেছেন। যেন এই বাস্তবতাকে উল্লেখ না করে ইতিহাস থেকে একে মুছে ফেলা যাবে।

দেশভাগের এই যে অনন্য হিংস্রতা, তা ইনতিযারকে ভাবিয়েছে। মান্টো বা কৃষণ চন্দরের মতো তিনি এর মাঝে কোনো লুকিয়ে থাকা আশার আলো দেখতে পাননি। সাম্প্রদায়িক সংঘাত, রাজনৈতিক অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা ঐতিহাসিক সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারা ভেঙে যাওয়া তাঁর কাছে মূল সমস্যা মনে হয়নি। তাঁর মনে জেগেছে আরও বড় প্রশ্ন। মানব প্রকৃতিতে কি সহিংসতার বীজ লুকিয়ে আছে? মানুষের ইতিহাসে এই যে নৃশংসতা তা কি শুধুই ঐতিহাসিক? নাকি এর কোনো গভীর নৃতাত্ত্বিক দিকও আছে? এই প্রশ্নে ইনতিযার নিজেও ঘাবড়ে গেছেন। তাঁর মনে হয়েছে এই প্রশ্নের ধাক্কায় যেন তাঁর হাতের আঁজলা দিয়ে ধরতে চাওয়া মানুষের সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস জলের মতো গলে বের হয়ে যাচ্ছে। মানবসভ্যতার বাইরের আবরণে আঁচড় কাটলেই কেন বের হয়ে আসে বিদ্বেষ ও বর্বরতা? যতই তাকে ঢেকে রাখা হয় একটু রাজনৈতিক অস্থিরতার সামান্য আঁচড়ে সে বিস্ফোরিত হয়ে বের হয়ে আসে।

ইনতিযারের সৃষ্টির একটি বড় অংশ এই অন্বেষণে কেটেছে। একে ইতিহাসের বড় রাস্তায় একজন পথিকের বিস্ময়ও বলা যায়। বিস্ময়, কারণ তিনি কোনো পথ প্রদর্শককে মেনে নিয়ে তাঁর পিছু পিছু চলতে নারাজ। সুফিরা বলেন, যার গুরু নেই, শয়তান তাঁর গুরু। ইনতিযার শয়তানকেও মেনে নিয়েছেন এমন নজির নেই। তাই তিনি একজন বিস্মিত বিহ্বল দ্রষ্টা। ইতিহাসের বিপুল অরণ্যে মানুষের সম্মিলিত বয়ান আদৌ আছে কি না সেই প্রশ্নে দ্বিধাচ্ছন্ন ইনতিযারের গল্পের, উপন্যাসের চরিত্ররা তাই নিজ অস্তিত্বের জটিলতা উন্মোচন করতে করতে এক সময় খোদ গল্পকেই ঝুঁকির সামনে ফেলে দেয়।

তাঁর 'হাড়ের অবয়ব' গল্পে আকালের কবলে পড়া একজন মানুষ মরে গিয়ে বেঁচে ওঠে। এরপর তার খিদে ছাড়া আর কোনো অনুভূতি কাজ করে না। তার খাবারের জোগান দিতে দিতে সবাই অতিষ্ঠ। একজন সাধু এসে আসল কথা বললেন, 'হে শহরবাসী, খোদা তোমাদের ওপর রহম করুন। মরা মানুষকে তোমরা একলা ছেড়ে দাও। তোমাদের শহরে একজন মানুষ মরল, তোমরা তার শিয়রেও বসলে না। আর অশুভ এক আত্মা সেই দেহ দখল করে নেয়। খোদা তোমাদের শহরকে রহম করুন।' মানুষ নিঃসঙ্গতা আর অর্থহীনতার চাপে মরে যায়। তখন তার শিয়রে যদি অন্য মানুষ এসে না বসে তখন সেই মানুষকে দখল করে নেয় অশুভ আত্মা। সেই মরা মানুষ তখন আবার বেঁচে ওঠে শুধু এই কারণে যে সে মরে যাওয়ার পর তার শিয়রে অন্য মানুষেরা বসেনি। ফেলেনি দীর্ঘশ্বাস। তখন তার খিদে ছাড়া আর কোনো অনুভূতি কাজ করে না। কিন্তু মরে আবার বেঁচে উঠেছিলেন তো আরও একজন। যিশুর পবিত্র আত্মার কথাও গল্পে আসে। মরে বেঁচে ওঠা অশুভ আত্মা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারেন কেবল মরে বেঁচে ওঠা আরেকজন।

৩.

তাঁর জন্ম ১৯২৩ সাল। যখন সেই গ্রাম অন্য দেশ হয়ে যায় তখন তাঁর বয়স চব্বিশ। সারা জীবন সেই জীবন বারবার ফিরে এসেছে তার লেখায়। এসেছে তুলনা করে দেখা :

> আমি উত্তরপ্রদেশের দিবাই বুলন্দশহর জেলা নামে একটি ছোট গ্রামে থাকতাম। এটি নিজেই একটি পৃথিবী ছিল। দেশভাগের পর সেই জীবন কেটে যায়। আমাদের পুনর্জন্ম হয়েছিল। এই বছরের দীপাবলির আলো দেখে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল সেখানে পালিত উৎসবগুলো : ঈদ, শব-ই-বরাত, হোলি, দিওয়ালি। পিছন ফিরে তাকালে মনে হয় জীবন ছিল উৎসবের মিছিল। কথা বলার অনেক কিছুই আছে : গাছ, পাখি। কিছু পাখি ছিল যেগুলো আর কখনো দেখিনি।

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজন, সহিংসতা এবং ব্যাপক অভিবাসনের এক অযৌক্তিক কাহিনিতে প্রবেশ করে। দক্ষিণ এশিয়ায় সভ্যতার ইতিহাস বদলে যায়। সে সময়ের সহিংসতায় কতজন নিহত হয়েছিল তা কেউ

জানে না। কতজন বাস্তুচ্যুত হয়েছিল তার হিসেবও করবে কে? আমরা যা জানি তা হলো, ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে, প্রায় নব্বই লাখ হিন্দু এবং শিখ ভারতে এসেছিল এবং প্রায় ষাট লাখ মুসলমান পাকিস্তানে গিয়েছিল। নিহত হয়েছিল সম্ভবত প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষ! ইতিহাসবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীরা শারীরিক ক্ষতির পরিমাপ করেছেন। পরিমাপের বাইরে থেকে যায় মানসিক আঘাত ও কষ্ট এবং সহসা নেমে আসা নৈতিক অবক্ষয়। এগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে কয়েকটা রাষ্ট্র। দেশের সঙ্গে ভাগ হয়েছিল মনও।

ইনতিযার হোসেইন যা লিখেছেন তার সবই কোনো না কোনোভাবে এই বিভক্তির, ইতিহাস হারিয়ে নতুন ইতিহাস লেখার গল্পের সাথে জুড়ে আছে। দেশভাগের হিংস্রতা, দেশ ছাড়া, নিজের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ, আর তাই নিজের সঙ্গে নিজের বিচ্ছেদের গল্প। দেশভাগের কারিগররাও এমন বীভৎসতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। জওহর লাল নেহরু, ১১ নভেম্বর ১৯৪৬-এ কৃষ্ণ মেননকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার! আমাদের শান্তিপ্রিয় জনগণ কীভাবে এমন জঙ্গি আর রক্তপিপাসু হয়ে গেল! দাঙ্গা শব্দটি এর জন্য যথেষ্ট নয়। এ তো হত্যা করার এক দুঃখজনক আকাঙ্ক্ষা।'

এর সঙ্গে আছে ইনতিযারদের যুগের মানুষের বিস্ময় আর বিহ্বলতা। তাঁরা কেউই এমন বাস্তবতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। দেশভাগের হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তীকালে স্থানচ্যুতি লেখকদের একটি প্রজন্মকে হতবাক করে রেখেছিল। তারা মানবিক বেদনা ও যন্ত্রণার এই জঘন্য কাহিনিকে এর সমস্ত বীভৎসতাসহ লিখে রেখে গেছেন। সাদাত হাসান মান্টো, ভীষ্ম সাহানি, কৃষণ চন্দ, কর্তার সিং দুগ্গাল, অমৃতা প্রীতম, রাজিন্দর সিং বেদি দাঙ্গার বর্বরতা বর্ণনা করেছেন।

৪.

ইনতিযার প্রথম দিকে আশাবাদী মানুষ হিসেবে দেশভাগকে দেখার চেষ্টা করেছেন। এই নির্মম বাস্তবতাগুলোকে হোসেইন হিজরতের প্রেক্ষা দিয়ে দেখছেন। ক্রমে এও দেখেছেন যে, অবিচার থেকে মুক্তি পাওয়ার নতুন ন্যায্য বাস্তবতা তৈরির চেষ্টা আবার পুরাতনের হাতে কয়েদ হয়ে যায়। তবে নিজে নিরীশ্বর দর্শনে আগ্রহী লেখক মনে করতেন না যে কোনো অবিমিশ্র ধর্মীয় বয়ান এই ঘটনাগুলোকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু সেই উৎপ্রেক্ষা দিয়ে হিজরতের ট্রাজেডি হিসেবে দেশভাগকে উপস্থাপন করলেন তিনি। কিন্তু ইনতিযারের এই বয়ানে লেখা গল্পে দেশভাগের শিকার মানুষগুলোর বেদনা যা মান্টোতে পাওয়া যায়, তা অনুপস্থিত। এই রকম করে তিনি সেই বহাল রাজনীতি, নৈতিকতা আর ভাবনার ধরনকে অস্বীকার করার কথা বলেন। কারণ এই বহাল নৈতিকতা মানুষের হিংস্র অমানবিকতাকে যুক্তি দিয়ে জায়েজ করতে চায়। কারণ এই বহাল রাজনীতি এক গোষ্ঠীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কেবল অপর গোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা দাবিয়ে রেখেই অর্জন

করতে পারে। কারণ এই ভাবনার ছক তাঁর পাঠককে এক খণ্ডিত বর্তমানে আটক করে। তাদের অতীত অসহায় হয়ে থাকে রাষ্ট্রের বয়ানে।

এই ওডিসির শুরু হয় ১৯৪৭ সালে। ভারত বিভাজনের পরে মুসলিম, হিন্দু এবং শিখদের একটি বেদনাদায়ক স্থানচ্যুতি ঘটে। কিন্তু ইনতিযার একে মুসলমানদের জন্য ভাবতে চেয়েছেন এক অনুগ্রহ হিসেবে। পেছন দিকে তাকিয়ে তিনি ১৯৪৭-এর মুসলমানদের ৬২২ সালের মদিনায় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহাসিক হিজরতের সঙ্গে মিলিয়ে দেন। নবীজির বিচ্ছেদের যন্ত্রণা গড়ে দিয়েছিল এক নতুন রাষ্ট্র জন্মের সৃজনশীল সম্ভাবনা। একইভাবে, ১৯৪৭ সালের মুসলিম অভিবাসনকে ইনতিযার ভাবতে চেয়েছিলেন সেই মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের একটি পুনর্বিন্যাস হিসেবে।

১৯৪৭ সালের হিজরতকে সৃজনশীলভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন ইনতিযার। নতুন দেশের মানুষদের নিয়ে তিনি অতীতের দিকে ফিরে তাকানোর কথা ভেবেছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন তাদের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করতে। ঠিক তখন রাষ্ট্রের দোলাচল ইনতিযারের এই 'উইশফুল থিংকিং'কে ব্যর্থ করতে কসুর করেনি।

ইনতিযার যে পৃথিবীর মানুষ হিসেবে নিজেকে ভাবেন, ভারত বিভাজন সেই সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে অসভ্যভাবে ব্যাহত করেছিল। ঘটনাপ্রবাহের মাঝ থেকে বের হয়ে আসা অভিবাসীরা নতুন দেশে দিশেহারা। তাদের পরিচয় মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন। ইনতিযারের প্রথম দিকের গল্পগুলোতে, বিশেষ করে তাঁর প্রথম দুটি সংকলন—গালি কুচে (গলি এবং উপগলি) এবং কংকড়ি (নুড়ি)-তে, বেশ কয়েকটি চরিত্র তাদের অতীতের সাথে আবার সংযোগ স্থাপনের জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা করে। তাদের ভাঙা পরিচয়কে আবার দাঁড় করানোর কী মরিয়া চেষ্টা সেখানে! এই মানুষগুলোর নিজের সমস্ত অনুভূতি লুট হয়ে গেছে। স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা হারানো যে কী দুর্দশা বয়ে আনে তা বুঝতে পারা সহজ নয়। হোসেইনের এই গল্পগুলো যেন কিছু স্বপ্ন জাগিয়ে স্মৃতিশক্তিকে সক্রিয় করতে চায়। এই স্মৃতি খুব দরকার অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে। তিনি সেই সাংস্কৃতিক অতীতের স্মৃতিকে পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণের জন্য যাত্রা শুরু করেছিলেন। সে যাত্রা বিপজ্জনক। হাজার বছর ধরে উপমহাদেশের সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছিল যে সংস্কৃতি তাকে ভাগ হওয়া নতুন রাষ্ট্র খারিজ করেছে। ইনতিযার তাঁর গল্প দিয়ে এর পালটা লড়াই চালু করেছিলেন।

৫.

পাকিস্তান যাওয়ার ঠিক পরের স্মৃতি লিখেছেন তিনি। লাহোরের সেই সময়ের অভিবাসী কবি আর লেখকরা যে যার নিজের ছেড়ে আসা স্থানের পুনরাবৃত্তি করতে চাইছেন নতুন দেশে। নতুন দেশে ইনতিযারের সহায় দিল্লি থেকে আসা শাহিদ দেহলভি। সন্ধ্যায় নিয়ে গেলেন হাকিম নবি খানের বাড়ি। হাকিম সাহেব নিজেও

উপন্যাস লেখেন। শাহিদ সাহেব কয়দিন আগে তাঁর ফেলে আসা দিল্লি শহর ঘুরে এসেছেন। লিখেছেন রিপোর্টাজ। গিয়ে দেখা গেল দিল্লির আরও উজাড় হওয়া লোকেরা সেখানে হাজির। শাহিদ সাহেব তাঁর রিপোর্টাজ পড়ে শোনালেন। বড় লেখা। দিল্লির অলিগলি থেকে কীসের বর্ণনা নেই সেখানে? পুরো লেখা পড়ে শেষ করতে পারলেন না শাহিদ দেহলভি। কান্নায় গলা বুজে এলো। ইনতিযার তাকিয়ে দেখলেন উপস্থিত কারও চোখ শুকনো নেই। তিনি নিজে দিল্লিবাসী ছিলেন না। তাঁরও চোখে জল।

লাহোরে এমনিতে কবির কমতি ছিল না। ভারতের কোনো শহরে দাঙ্গা লাগত, তার পরই নামত উদ্বাস্তুদের ঢল। আর সেই ঢলে সর্বস্ব হারানো শায়েররা থাকবেই। সব ফেলে এলেও সঙ্গে নিয়ে আসতেন তাঁরা কবিতা। লাহোরে তখন দিকে দিকে মুশায়রা। সেই সময়ের এক মুশায়রার কথা...অনেক নামজাদা কবি এসেছিলেন জিন্নাহবাগ, সাবেক লরেন্সবাগ। দেশভাগ আর দাঙ্গা থাকত এমন সব মুশায়রার অন্যতম বিষয়। একেকটা লাইন যেন বুকে তীর হয়ে বিঁধত। বহু বছর পর ইনতিযার লিখেছেন যে, সেই রাতের কবিতার আসরের একজনের কথা শুধু মনে আছে তাঁর। কবি নাফিস খলিলি। মঞ্চে এক শায়ের পায়চারি করছেন। উজ্জ্বল গায়ের রং, চওড়া কাঁধ, গায়ে মখমলের জামা, হাতে ছড়ি। পায়চারি করছেন আর ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। ডান থেকে বামে। বাম থেকে ডানে। আর কবিতা পড়ছেন :

কী দেখো আমার মুখের দিকে?
কায়েদে আজমের পাকিস্তান দেখো

কেয়া দেখতা হ্যায় মেরি মু কি তরফ
কায়েদে আযম কি পাকিস্তান দেখ।

এরপর বহু মুশায়রা দেখেছেন তিনি। বহু জমজমাট আসর। পঞ্চাশ বছর পর তাঁর দেখা সব মুশায়রা নাফিস খলিলির আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। সেখানে সবাইকে ছাপিয়ে নাফিস পড়ে যাচ্ছেন :

কী দেখো আমার মুখের দিকে?
কায়েদে আজমের পাকিস্তান দেখো

কায়েদে আজমের পাকিস্তান শুধু দেখার জিনিসই হয়ে রইল। ইনতিযারের হিজরতের ব্যাখ্যা হয়ে গেল নিতান্ত দিবাস্বপ্ন। গণতন্ত্রের দমন, বেসামরিক সরকার বাতিল, সামরিক স্বৈরাচারের উদ্বোধন—সবই এককভাবে সম্পন্ন করেছিলেন ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে। ভারতের সাথে ১৯৬৫ সালের সামরিক প্রদর্শনীর বেদনাদায়ক পরিণতি; এবং, সম্ভবত সবচেয়ে বড়—১৯৭১ সালের যুদ্ধে বাংলাদেশের কাছে পরাজয়। সব মিলিয়ে পাকিস্তানের ভঙ্গুর ঐক্যকে একবারের জন্য উড়িয়ে দিয়েছিল।

১৯৭৪ সালে, এক সাক্ষাৎকারে ইনতিযার তাঁর আগের আশাবাদের কথা স্বীকার করেছিলেন। তবে এও বলেছিলেন যে, দেশভাগের যে মহান সম্ভাবনা তিনি কল্পনা করতেন সে সম্ভাবনা শেষ। আপাত মহান অভিজ্ঞতা জাতির কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে। যেমন গেছে। একটি জাতি প্রতিটি যুগে তার ইতিহাসকে তার স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখে না বা রাখতে পারে না। অভিবাসনের অভিজ্ঞতা ইনতিযারের দেখা মানুষদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। সেই উজ্জ্বল প্রত্যাশা এখন ম্লান হয়ে গেছে।

এইভাবে 'টাঙ্গে' (টাঙ্গা) গল্পের কোচম্যান ইয়াসিন। নিজের শহর থেকে আসা একজন অভিবাসীকে ইয়াসিন পুরো এক মাসের জন্য আশ্রয় দিয়েছিল। সেই লোক ইয়াসিনের ঘোড়া নিয়ে পালায়। ইয়াসিন খুব হতাশ। চারদিকে শুধু বেইমানি। মনে হয় প্রকৃতিও যেন সে কারণে মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। দশম শতাব্দীর সুফি আলী ইবনে উসমান জুল্লাবি, যাকে সাধারণ মানুষ ডাকে দাতা গঞ্জ বখশ নামে। তাঁর সমাধি মিনারে আঘাত করে ঝড়। ইয়াসিন বলে, 'এর আগেও ভয়ানক ঝড় হয়েছে সৈয়দ সাহেব। বন্যাও হয়েছে। অনেকবার নদী তার তীরে উপচে পড়েছে দাতা সাহেবের সমাধির পাদদেশ পর্যন্ত। কিন্তু কখনো মাজারের নিচের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারেনি।' কিন্তু এখন কী সব অঘটন ঘটছে! কিন্তু ঝড় এখন দাতা সাহেবের মিনার ধাক্কা দেয়! শেষ কথা ইয়াসিনের, 'এই দিনগুলোতে বেঁচে থাকার কোনো আনন্দ নেই।'

৬.

এই নিরানন্দ ইনতিযারের কাছে এক ইতিহাসের পরিণতি। এক ভুল সম্ভাবনার অবশেষ। ইনতিযার হোসেইন ১৯৭১ সালের বাস্তবতাকে ১৯৪৭-এর টানাপোড়েন হিসেবে দেখেন। এই প্রসঙ্গে ২০০৫ সালের সাক্ষাৎকারে তিনি জানাচ্ছেন : 'তৎক্ষণাৎ আমার এই অনুভূতি হলো যে, ১৯৪৭ যেন আমার মাঝে আবার জীবন্ত হয়ে এসেছে। সেই সব কথা এত জীবন্ত আর এত প্রবলভাবে মনে এলো যে আমি কী লিখব, কীভাবে লিখব কিছু না ভেবেই লিখতে বসে গেলাম।' এইভাবে লেখা উপন্যাসটি হচ্ছে তাঁর শ্রেষ্ঠতম কাজ 'বস্তি'।

দেশভাগ নিয়ে তাঁর ট্রিলোজিতে (*বস্তি*, *আগে সমন্দর হ্যায়* এবং *নয়া ঘর*) তিনি পাকিস্তানকে এক ভাঙনের গাথা হিসেবে দেখছেন। তিনি সরাসরি দ্বিজাতিতত্ত্বের যে বাস্তবায়িত রূপ তা নিয়ে প্রশ্ন করছেন। অস্বস্তিকরভাবে তাঁর দেশের শাসককুলের সামনে তিনি বলে দিচ্ছেন যে, ১৯৭১-এর ঘটনার জন্য যত আক্ষেপ, দোষারোপ হচ্ছে হোক, এর জন্য পুবের বাসিন্দাদের দায়ী করার কোনো উপায় নেই। নির্মম রকম সৎ হয়ে তিনি বলে দিচ্ছেন যে, পাকিস্তান তৈরির প্রথম যুগে নতুন দেশের পুরাতন এই মানুষদের মাঝে যে নিষ্পাপতা আর উদার-হৃদয় ছিল তার পেছনে ধর্ম ছিল না। ছিল সবার মাঝে সমান রকম সত্য হারানোর

বেদনা, দেশ হারানোর দুঃখ। যে পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশ একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে তার একটা ইশারা পৌঁছায় ইনতিযারের কাছে। ১৯৪৭ যদি ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশকে বিভক্ত করে, তবে ১৯৭১ বুঝিয়ে দেয় যে, ধর্ম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য সবচেয়ে দুর্বল বন্ধন।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা, এবং তর্কাতীতভাবে দেশভাগের ওপর সেরা উপন্যাস ইনতিযার হোসেইনের 'বস্তি'। গল্পের প্রধান চরিত্র জাকির একজন ইতিহাস শিক্ষক যার পরিবার ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে পাকিস্তানে এসেছিল। চারদিক থেকে যুদ্ধের খবর আসে। ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর জাকিরের বন্ধু আফজাল বন্য হংসের জাতক কাহিনি শোনায়। সে কাহিনিতে বুনোহাঁস জ্বলন্ত চন্দন গাছকে ত্যাগ করে না। কারণ এই চন্দন গাছের ছায়ায় সারা জীবন তার খুব সুখে কেটেছে। জাতককে বুদ্ধ এই গল্পটি শুনিয়ে ভিক্ষুদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওহে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি জানো সেই বুনো হংস কে ছিল? আমি নিজেই সেই বুনো হংস ছিলাম।'

৭.

'ও জো খোয়ি গ্যায়ি' (হারিয়ে গেছে যারা) গল্পে চারজন ব্যক্তি রয়েছে—একজন দাড়িওয়ালা লোক, এক যুবক, এক থলেওয়ালা লোক আর একজন মাথাফাটা ব্যক্তি। কোনো এক দাঙ্গা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে তারা। কোথায় যাচ্ছে জানা নেই। কারণ তারা কোথা থেকে কেন পালিয়ে এসেছে সেই স্মৃতিও নেই তাদের। যাওয়ার সময় তারা সন্দেহ করতে শুরু করে যে, তাদের সংখ্যা ক্রমে কমে আসছে। কিন্তু কে হারাচ্ছে সেই স্মৃতিও তাদের নেই। নিখোঁজ ব্যক্তির মুখ, এমনকি নামও মনে করতে পারে না তারা। মনে করতে পারে না যে, নিখোঁজ ব্যক্তিটি প্রকৃতপক্ষে একজন পুরুষ না নারী। তারা নিজেদের গণনা করে। ভুল হয়। আবার গণনা করে। প্রতিবার, যিনি গণনা করেন তিনি নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হন। আর তখন সেই ব্যক্তিই ভাবে যে আসলে সে নিজেই সেই নিখোঁজ মানুষ। যারা আছে এমনি করে তারা নিজেই নিখোঁজ মানুষ হয়ে যায়। শেষে তারা বুঝতে পারে তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে অন্যরা তাকে আছে বলে সাক্ষী দেওয়ার ওপর।

৮.

ইনতিযার দিল্লির ইতিহাস লিখেছেন—দিল্লি থা জিস কা নাম। যার নাম ছিল দিল্লি। দিল্লির এক শরৎসন্ধ্যা উঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু তাঁকে চিরকালের মতো এর সাথে জুড়ে দিয়ে গেছে যাওয়ার আগে। দেশভাগের তিন বছর পরের কথা। তিনি দিল্লি এসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বন্ধু রেবতি মোহনের সঙ্গে। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার পবিত্র অঙ্গনে যখন পা রাখলেন তখন দিন এসে মিলছে রাতের সঙ্গে। কিন্তু আগের সেই কোলাহল কোথায়? দরগার বাইরে ফুল, মোমবাতি, আগরবাতির দোকানে